চিত্রলেখা

নকশা সম্পর্কে আগের পাঠগুলোতে আমরা জেনেছি সাথে সাথে কিছুটা আনুশীলনও করেছি। এই পাঠে আমরা গল্পের বিষয়কে ভেবে তার সাথে মিলিয়ে ছবি আঁকব। স্বাধীনভাবে মনের ভাব কে প্রকাশ করব ছবি আঁকার মধ্যদিয়ে। তাইতো এই পাঠের নাম চিত্রলেখা। এই পাঠে যে গল্পটি আমরা পড়ব, তার নাম আমি । গল্পটি লিখেছেন লীলা মজুমদার। গল্পটি কিন্তু খুব মনযোগ দিয়ে পড়তে হবে। এই গল্পটি নিয়ে কিছু কাজ করতে হবে, যা কিনা গল্পের শেষে দেয়া আছে।

আমি

লীলা মজুমদার

এই যেটাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি, সেটাকে কি লাঠি ভেবেছ? মোটেই না। ওটা হল গিয়ে আমাদের চাকর জগুর ছাতার বাঁট। জগু ওটাকে হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে ট্রামে চেপে বাজারে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা দুষ্টু লোক ওর মধ্যে একটা আধপোড়া বিড়ি ফেলে দিয়েছিল। তাই ছাতার কাপড়চোপড় পুড়ে একাকার। জগুর রাগ দেখে কে। বাড়ি এসে ছুঁড়ে ওটাকে সিঁড়ির নীচে ফেলে দিয়েছিল। আমি লোহার খোঁচাগুলো ছাড়িয়ে ওটাকে নিয়েছি।

লাঠির আগায় পুঁটলি বাঁধা দেখেছ? ওতে আমার টিফিন আছে। পিসিমার ডুলি থেকে বের করে নিয়েছি। ওরা আমাকে কেউ কিছু দেয় না, তাই নিজেই নিতে হয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে কালোমতন একটা কী যাচ্ছে দেখেছ? ওটা ছোটুকার কুকুর, পুকি। কোনো কিছু আমার নয়। খালি প্যান্টটা আর শার্টটা। জুতোটাও গন্টুর। ওকে না বলে নিয়েছি।

কোথায় যাচ্ছি জানো? রামধনুর খোঁজে। কেন জানো? রামধনুর গোড়ার খুঁটিতে এক ঘড়া সোনা পোঁতা থাকে নাকি, তাই। সোনা দিয়ে কী করব জানো? এক-শিংওয়ালা একটা ঘোড়া কিনব। কেন কিনব বলব? ওতে চেপে দিদিমার কাছে ফিরে যাব বলে।

দিদিমার কাছে কেন যাব জানতে চাও? দিদিমা আমাকে দারুণ ভালোবাসে, তাই। আমার জন্যে নারকেল-নাড়ু বানায়, ঘুড়ি কেনে, আপেল কেনে, রাত জাগতে দেয়, পড়তে বলে না, কেউ বকলে রাগ করে, কেউ নালিশ করলে বুকে টেনে নেয়, ঢোল পিটিয়ে ঘুম ভাঙালে হাসে, পড়ে গিয়ে সারা গায়ে কাদা লাগলে কোলে নেয়।

আমি খুব খারাপ ছেলে, তা জানো? মা বাবা ছোটকা, পিসিমা, বড়দি, মেজদি, সব্বাই বলেছে, আমার মতো খারাপ ছেলে ওরা কোথাও দেখেনি। আমি ঘুম থেকে উঠতে চাই না, দাঁত মাজি না, পড়তে চাই না, খাতা পেন্সিল খুঁজে পাই না, বই ছিড়ি, স্নান করতে দেরি করি, মুখোমুখি উত্তর দিই, বড়োদের কথার অবাধ্য হই। আমার মতো দুষ্টু ছেলে হয় না। জানো, আমি না বলে ছোড়দির লজেঞ্জুষ সব খেয়ে ফেলেছিলাম, একটাও রাখিনি!

জানো, আমি ভালো করে ভাত খাইনা, ফেলি, ছড়াই, রাগমাগ করি, খালিখালি কাঁচা আম খেতে চাই, বাতাসা খেতে চাই। আমি দিদিমার কাছে চলে যাচ্ছি। দিদিমা আমাকে ঝকঝকে মাজা কাসার গেলাসে করে জল খেতে দেয় আর হাতে একটা লালচে বাতাসা দেয়। আমি জলের মধ্যে, বাতাসাটাকে যেই ফেলি, বাতাসাটাও অমনি জল-টুস-টুস হয়ে ডুবে যায়। তক্ষুনি চো চো করে জলটা খেয়ে ফেলতে হয়। নইলে গুঁড়ো হয়ে যায়।

আমার দিদিমা দুপুরবেলায় কেষ্টচূড়া গাছের নীচে মাদুর পেতে, বালিশ নিয়ে আমার পাশে শুয়ে, আমাকে গল্প বলে। সব সত্যি গল্প। দিদিমার বাবা-কাকারা কেমন গোরাই নদীতে কুমির দেখেছিল, তাদের বুড়ি জেঠিমাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর যেই-না মাঝিরা নৌকো করে গিয়ে কুমিরের মাথায় দাঁড়ের বাড়ি মেরেছে, অমনি বুড়িকে ছেড়ে দিয়েছে। আর ওরাও নৌকোতে তুলে নিয়েছে। আর বুড়ি কেঁদে কেঁদে বলছে, বাঁচালি বাপ, বেঁচে থাক বাপ আমার আমসত্ত্ব শুকোয়নি আর আমাকে কিনা কুমিরে নিলে!

আমার দিদিমা এই সব গল্প বলে আর ছোট্ট কাগজের ঠোঙা থেকে আমার জন্যে আমসত্ত্ব বের করে দেয়। আমি চেটে চেটে খাই আর দিদিমা আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দেয়।

ওরা বলে, বাবা-কাকারা যখন কাটোয়া গেছিল আর আমি দিদিমার কাছে দু-মাস ছিলুম, দিদিমা তখন আমার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে। আমার বাবা মা এইরকম বলে।

একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি দিদিমা আর আমি মট্‌কা চিবিয়ে খেয়েছিলুম। আমরা বাঁধের ধারে গেছলুম ফেরবার সময় আর হাঁটতে পারি না। শেষটা একটা আলো ওপর বসলুম দু-জনায়। দিদিমা আমার পায়ের গুলি ধরে নেড়ে দিল, অমনি আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। তারপর সেখান দিয়ে মটকাওয়ালা যাচ্ছিল, দিদিমা মট্‌কা কিনে বলল কাল বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে যা। মাওয়ালাকে চেনে আমার দিদিমা। তারপর আমরা মটকা চিবোতে চিবোতে বাড়ি চলে এলুম। এসে লুচি খেলুম। দিদিমা আমার জন্যে রোজ রাত্রে লুচি করে দিত। বলত, মাকে যেন আবার বলিসনে, সে হয়তো রোজ লুচি খেলে রাগ করবে। মাকে আমি কিছু বলিনি।

দিদিমা আমাকে বেড়াল কোলে নিয়ে শুতে দিত। পুষি আমার বালিশে মাথা রেখে আমার পাশে রোজ ঘুমোত। আর আজ দেখোনা পুষিকে আমার থালার কোনায় একটু খেতে দিয়েছিলুম বলে সে কী বকাবকি! তাই আমি আর এখানে থাকবনা। রামধনু খুঁজে তার খুঁটির গোড়া থেকে সোনার ঘড়া বের করে তাই দিয়ে এক-শিংওয়ালা ঘোড়া কিনে, তাতে চেপে দিদিমার কাছে গিয়ে হাজির হবো। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যাবে না দিদিমা? আমি জানি, ওসব ঘড়া-টড়ার গল্প, এক-শিংওয়ালা ঘোড়ার গল্প দিদিমা সব বানিয়ে বলে। তাই সত্যি করে যখন এক-শিংওয়ালা ঘোড়া চেপে হাজির হব, কেমন চমকে যাবে না দিদিমা?

এই গল্পটি পড়ে কেমন লাগলো? গল্পটি নিয়ে কি মনে কোন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে?

যা করব—

- গল্পটি নিয়ে নিজের অনুভূতি আর প্রশ্ন বন্ধু খাতায় লিখব। এগুলো নিয়ে ক্লাসের সকলের সাথে আলোচনা করব।
- গল্পটির মূল চরিত্রগুলো নিজের মত করে আঁকতে হবে। বন্ধুরা মিলে আগে ঠিক করে নিব কে কোন দৃশ্য আঁকব। ছবি এঁকে গল্পটির যেকোনো একটি দৃশ্য রচনা করব। মনে রাখতে হবে সবাই মিলে কিন্তু পুরো গল্পটি ছবির দিয়ে লিখতে হবে।
- প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ছবির দৃশ্য ক্লাস রুমে প্রদর্শন করব। এর নাম দিব চিত্রলেখা। কারণ ছবির মাধ্যমে পুরো গল্পটি লিখতে হবে। ছবিই হবে লেখার ভাষা।
- চিত্রশিল্পীরা যেমন নিজেদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে দর্শকদের কে নিজের ভাবনা এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন তেমনি আমরাও আমাদের চিত্রলেখার মাধ্যমে অনুভুতিটা শ্রেণিতে আগত দর্শকদের জানানোর চেষ্টা করব।

গল্পের সাথে ছবি এঁকে চিত্রকর হয়ে আমরা জানার চেষ্টা করেছিলাম চিত্রশিল্পীদের জগত সম্পর্কে। এখন আমরা জানব এমন এক ব্যাক্তিত্ব সম্পর্কে যিনি লিখেছিলেন কালজয়ী সব নাটক। যারা নাটকে বা সিনেমায় অভিনয় করেন তাদের বলা হয় অভিনয় শিল্পী আর যিনি নাটক রচনা করেন তাকে বলা হয় নাট্যকার।

মুনির চৌধুরী

মুনির চৌধুরী ছিলেন শিক্ষক, নাট্যকার, সুবক্তা, বাংলা কিবোর্ডের প্রবর্তক, ভাষা আন্দোলনের কর্মী এবং সর্বোপরি আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একজন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ১৯৫২ সালে কারাবরণ করেন। জেলে থাকাকালীন তিনি অধ্যবসায়ের সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, জেলের ভেতর থেকে বাংলায় এমএ পরীক্ষায় অংশ নেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে আরেকটি স্নাতকোত্তর অর্জন করেন।

কারাবাসের সময় তিনি বাংলায় তাঁর বিখ্যাত প্রতীকী নাটক 'কবর' রচনা করেন এবং নাটকটি জেলখানাতেই মঞ্চস্থ হয়। তিনি পাকিস্তানি শাসকের যে কোনও ধরণের সাংস্কৃতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক হল-রক্তাক্ত প্রান্তর , চিঠি, দণ্ডকারণ্য , মানুষ, নষ্ট ছেলে, রাজার জন্মদিন, চিঠি, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য । তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। নাটক ছাড়াও তিনি ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং বিদেশি নাটক অনুবাদ করেন।

তিনি ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দেয়া তার পুরস্কার সিতারা-ই-ইমতিয়াজ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের বাঙালি সহযোগী আল-বদর, আল-শামস বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।

যা করব—

- শহিদ মুনীর চৌধুরীর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আমরা আরো জানার চেষ্টা করব।

চিত্রলেখা সম্পর্কে লিখি